‘কুরপালা’র রমেশচন্দ্র সেন

স্বপন মজুমদার

বাংলা সাহিত্যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে রমেশচন্দ্র সেন অনুপস্থিত। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী যে জীবনবোধ, মানবিকতা, সত্য সুন্দর ন্যায়ের গাথা রচনা করেছে কি করে যেন তা বাঙালী পাঠকের নিকট অজানা, অশ্রুতএবং অনাস্বাদিত। আজকের সীমিত পাঠকের কথা বলছি না, আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে যখন বাঙালী সমাজে সাহিত্য পাঠের চল ছিল বিশেষত বাড়ীর মা - দিদিমা - পিসীমাদের মধ্যে তখনও তিনি নামহীন, তখনও তাঁর রচিত সাহিত্যের পরশ থেকে বঞ্চিত ছিল বাঙালী পাঠক। একেবারে অতি নগণ্য পাঠকের মধ্যে ছিল তাঁর ঘোরাফেরা। তবে সে পাঠকরা সব দিক থেকে একটু অসাধারণ, সাধারণ নন। কে বা কারা যে তাঁকে সবার অজান্তে অলক্ষেচুপিচুপি নিঃসাড়ে গুম করে দিয়েছে। যারা গুম করেছে তারা সন্ত্রাসবাদী না আতঙ্কবাদী কিংবা জঙ্গী না উগ্রপন্থী তা অবশ্য জানা নেই। বর্ত্তমান সমালোচক বেশ কিছু লাইব্রেরিয়ান - কে দেখেছেন যাঁরা রমেশচন্দ্রের নাম - ই শোনেন-নি, তাঁর রচনা পাঠ তো দূরের কথা। কিন্তু এটা পরিষ্কার তাঁর রচনার মধ্যে এমন কিছু আছে বিশেষত নিপীড়িত গ্রাম বাংলার কৃষক জনতার ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, মান অভিমান, হাসি কান্না, রাগ ক্রোধ আক্রোশ, মানবিকতা, সাহসিকতা, প্রেম প্রীতি ভালোবাসা প্রভৃতি মানবীয় গুণাবলী যা ব্যক্তিগত স্তর অতিক্রম করে সামাজিক রূপ ধারণ করেছে।ব্যক্তির পরিবর্ত্তে সমষ্টি তথা সমাজ বড় হয়ে উঠেছে। দুই বিপরীতমুখী চরিত্র এমন জীবন্তভাবে তিনি আঁকতে পেরেছেন, এমন সহজ সরল নির্ম্মেদ আকুতি - ভরা ভাষার চরিত্র চিত্রণ করেছেন মনে হয় যেন পাহাড়ের স্বচ্ছ ঝর্ণাধারা। না আছে কোন নাটকীয়তা, না আছে গোপন করার প্রচেষ্টা। কোন কিছু বিপজ্জনক বিষয়ের পাশ কাটানো বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা নেই। রমেশচন্দ্র সেনের ‘কুরপালা’ পাঠ করার পর এমনই মনে হয়েছে। তাঁর আরো যে কয়েকটা ছোটগল্প পড়ার সুযোগ ঘটেছে সেখানেও তাঁর রচনা অনান্য অনেক মার্কসবাদী সাহিত্যিকের থেকে মর্ম্মস্পর্শী এবং বিপজ্জনক। সুতরাং গুম করে দেওয়ার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

রমেশচন্দ্রের ‘কুরপালা’ উপন্যাস প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। বাংলা সাহিত্যে গ্রাম তথা কৃষক জীবনের যে আলেখ্য আমরা খুঁজে পাই তাতে কুরপালা যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস তাতে কোন সন্দেহ নেই। পড়তে পড়তে মনে হচ্ছিল ‘পদ্মানদী’ বা ‘ইছামতী’-র থেকেও দুরন্ত, জীবন্ত এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ‘পঞ্চগ্রামের’ থেকেও এগিয়ে যদিও ‘পঞ্চগ্রামে’র বিশালতা আরো ব্যাপক, আরো বহুমাত্রিক, নানা স্বাদে বর্ণে গন্ধেভরা।

কুরপালা উপন্যাসে ঘটনার কোন নাটকীয়তা নেই, কোন চমক নেই। কোন্‌টা যে প্রধান চরিত্র, কে যে নায়ক তা বোঝা দুষ্কর। মনে হয় গোটা গ্রামটাই তার নায়ক যদিও পরের দিকে শঙ্কর নামক এক তণ উচচ শিক্ষিত পুরানো জমিদারের সন্তানকে নায়ক বলে মনে হয় যে কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আর বাংলা সাহিত্যে মর্যাদা সম্পন্ন দৃঢ় বলিষ্ঠ নারী চরিত্র বিশেষ করে গাঁয়ের কৃষক রমনীর বড় অভাব। এই ঔপন্যাসে ‘হাস্য’ নামে এমন এক মহীয়সী নারী চরিত্র আছে যার তুলনা মেলা ভার।

পাশাপাশি দুটো গ্রাম কুরপালা আর রানীভাঙা। মাঝখানে রানীর খাল যা সোজা গিয়ে মিশেছে রূপমতীর গাঙে। কুরপালা আর রাণীডাঙা যেন দুই ভিন্ন গ্রহ। কুরপালায় নিকষ কালো অন্ধকার, হত দরিদ্র কৃষক জোলা তাঁতী অস্পৃশ্য অচছুৎদের গ্রাম। আর খালের ওপারের রানীডাঙা জমিদার গোমস্তা নায়েব উকিল মোক্তার ডাক্তার স্কুলমাস্টার সুদখোর

মহাজনদের গ্রাম। এ গ্রামে আছে পোষ্ট অফিস, স্কুল, লাইব্রেরী, রাস্তাঘাট। রানীডাঙা আর কুরপালা, অত্যাচারী আর অত্যাচারিতের দ্বৈরথ মুখরিত জীবন্ত প্রতীক। রানীডাঙার পরজীবী পরান্নভোজীদের মনের কোনে উঁকি মারা বাসনা সগর্বে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোষণা করে আমরাই কুরপালার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, ভালো মন্দের বিচারক, জো-হুজুর আজ্ঞে হুজুর বলে সেলাম ঠুকবে, মাথা নিচু করে চলবে। খোদ জমিদারের মাথায় যখন লাঠির আঘাত পড়ল, রানীডাঙা তখন ক্রোধে প াগল। "সকলেরই মুখে ঐ এক কথা--- কুরপালার এতো বড় অস্পর্ধা যে রানীডাঙারগায়ে হাত তোলে, তাও যার তার নয়, একেবারে রামেন্দ্র বাবুর গায়ে।" যেভাবে হোক কুরপালাকে জব্দ করতেই হইবে, চাষা ভূষাদের সমঝাইয়া দিতে হইবে যে রানীডাঙা এখনও মরে নাই।" কিংবা যখন স্থানীয় কংগ্রেসের অফিসরানীডাঙার পরিবর্ত্তে কুরপালাকে বেছে নেওয়া হয় তখনও রানীডাঙার মনোভাব বদলায়নি। সদ্য গঠিত কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা সবাই রানীডাঙার। খানা - খন্দ জলা এবাড়ি ও বাড়ীর উঠান পেরিয়ে যখন তাদের কুরপালায় আসতে হয় তখনও তাদের সমান নাক উঁচু মনোভাব ধরা পড়ে। গ্রামের নামের দিকে তাকালেও বেশ বোঝা যায় দুই গ্রামের বৈপরীত্য। একটা হল রানীদের ডাঙা। আর র ানীর ডাঙা অবশ্যই রাজা - রানী আর তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের ডাঙা। বিপরীতে কুরপালা যেন কুরূপা। ছন্নছাড়া হতদরিদ্রের গ্রাম। বাংলাদেশের এমন অনেক গ্রাম আছে যাদের নাম দেখে বোঝা যায় কোন্‌টা অত্যাচারী আর কোন্‌টা অত্যাচারিত। সাধারণত যেসব গ্রামের নামের সাথে 'রাজা', 'রানী' বা 'পু' যুক্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেসব গ্রাম স্থানীয় জমিদার নায়েব গোমস্তাদের গ্রাম।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতার দৃষ্টিতে কুরপালা যতই কুরূপা হোক, যতই শ্রীহীন বা দুর্দশার সাগরে নিমজ্জিত হোক, কুপ ালার নিজস্ব সৌন্দর্য্য আছে। "ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখীর কলকূজনে গ্রামে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, ঝোপে ঝে াপে লাল টুকটুকে তেলাকুচো ফল পাকিয়ে থাকে, বসন্তে আমের বৌলে বৌলে গাছ ছাইয়া যায়---বর্ষায় বিলের কচুরিপ ানার পাতাগুলি সাপের ফণার মতন দুলাইতে থাকে আবার রাত্রে জোনাকির ঝিলিমিলিতে মনে হয় কেযেন দেওয়ালীর দীপ জ্বালিয়াছে। আবার দিনে আকাশভরা সোনালি রোদ। সূর্য্যের অফুরন্ত প্রাণশক্তিধরিত্রীর গায়ে লুটোপুটি খায়। চিরকিশোর প্রণয়ী যেন প্রণয়িনীর গায়ের ওপর গড়াইয়া পড়ে। রানীর খালে, জলজঘাসের ডগায় ডগায় রবি রশ্মির অপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য। বিলান জমি কাশের ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির শুভ্রস্নেহ ঢেউ খেলিতেছে মাঠের উপর। কে বলিবে যে এই জমির পিছনে কুরপালার পুঞ্জিভূত দুঃখ দুর্দশা লুকাইয়া আছে।" রমেশচন্দ্র প্রকৃতির রূপ বর্ণনায় কেবল সিদ্ধহস্ত নন্‌, এ প্রকৃতি যে মানুষের সাথে মাখামাখি করে গায়ে জড়িয়েআছে। আলাদা করে অরণ্যের চাঁদনী রাতের সে প্রকৃতিকে খুঁজতে হয়না। তাঁর কাছে মানুষ আর প্রকৃতি বা প্রকৃতি আর মানুষ পৃথক হয়েও যেন এক। এখানে কোন অপু নেই যে ক াশফুল আকীর্ণ ধু-ধু প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে বা লেখক নিজেও নন্‌ যাঁর কাছে প্রকৃতির পৃথক অস্তিত্ব ধরা পড়বে। গ্রামীন জনজীবনের, তার অর্থ - সামাজিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিটি ডিটেলের প্রতি ছিল রমেশচন্দ্রের গভীর অনুসন্ধিৎসা। টুকরো টুকরো প্রায় প্রতিটা বিষয় তিনি উল্লেখ করেছেন। কুরপালায় জেলেদের মধ্যে অনেক নাম ডাকের ল াঠিয়াল ছিল। 'জমি দখল করিতে হইলে, প্রজা বিদ্রোহ হইলে, দাঙ্গা বাধিলে জমিদাররা, ধনীর সর্দাররা লাঠি ভাড়া করে। বিনিময়ে তারা জমি পায়, ভিটা- মাটি ভোগ করে। এই সর্দারদের লাঠি কুরপালার গর্বেরবস্তু ছিল।" অতি প্রাচীন কাল থেকেই লাঠি চালানো ছিল মানুষের সহজাত। কিন্তু এই লাঠি নিজেই তার জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার হয়ে ওঠেনি। আত্মরক্ষা ও আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবে পারদর্শী লাঠিয়ালরা ছিল সর্দার, দলপতি বা দলনায়ক। প্রাচীন কালের ইতিহ াস এ সাক্ষ্য বহন করে। মধ্যযুগে রাজকীয় সেনাবাহিনীর পার্ট টাইম সদস্য হিসাবে এই লাঠিয়াল সম্প্রদায়ের পারিভা ষিক নাম পাইক বরকন্দাজ যারা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার সুবাদে নিষ্কর জমি ভোগ করত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিদ্ধে প্রথম দিকের কৃষক বিদ্রোহগুলিতে এই লাঠিয়াল সম্প্রদায়ের অবদান ভোলার নয়। পরবর্ত্তীকালে এই লাঠিয়ালদের বৃটিশ সৃষ্ট ভূমধ্যকারীরা স্ব স্ব স্বার্থে কাজে লাগায়। বাংলাদেশেএমন অনেক গ্রাম আছে যেগুলি ডাকাতে গ্রাম নানে পরিচিত। এগুলি মূলতঃ লাঠিয়াল সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত অন্যের দেওয়া নাম।

উপন্যাসের স্থানে স্থানে শ্রী সেন অসংখ্য বিষয়ের উল্লেখ করেছেন যা থেকে তাঁর জীবনবোধ সম্পর্কে ধারণা জন্মায়,ধারণা জন্মায় নির্যাতিতের প্রতি তাঁর দীর্ঘশ্বাসের তীব্রতা, তাঁর অকৃত্রিম মমতাভরা ভালোবাসা। গাঁয়ের কৃষক জীবনের রাল ত্রুডিটিকে যেমন তিনি আঘাত করেছেন তেমনি একইসঙ্গে তুলে ধরেছেন তাদের সরলতা। আধুনিক সভ্যতার লোভ ল

ালসা ভোগের প্রতি অন্তহীন দৌড়ের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ সংগঠনের বিপরীতে চাক্ষুস করেছেন গ্রামীন সমাজ বন্ধনকে। গাঁয়ের কৃষক সমাজ সংগঠনের সম্পত্তি এবং খুব স্বাভাবিকভাবে সম্পত্তির তারতম্য আছে বটে তা কিন্তু মোটেই মৌলিক বা প্রধান নয়, নিছকই অপ্রধান। "এখানে লোকের মর্য্যাদা শুধু টিনের ঘর বা হাল বলদের মালিকানায় নয়, মর্য্যাদা চরিত্রের উৎকর্ষে। স্বরূপ মাঝির ছেলে নসীরামের হাল মাত্র দুখানা, বৃদ্ধ জগুসর্দারের তাহাও নাই কিন্তু তারাই নিজ নিজ জাতির মোড়ল বা মাতব্বর।"

গ্রাম বাংলার কৃষক জনতার ব্যক্তিগত সুখ দু খ, মান অভিমান, হাসি কান্না, রাগ ক্রোধ আক্রোশ, মানবিকতা, সাহসিকতা, প্রেম প্রীতি ভাবের পটভূমি। জমি আর কৃষক বা কৃষক আর জমি যেন পরস্পরের অন্তরাত্মা, পরস্পর নিবিড় প্রেমে আলিঙ্গনাবদ্ধ। কৃষকের দেহ-মন-প্রাণে, স্বপ্নে কল্পনায়, চিন্তা ভাবনায়, শিরা-উপশিরায়, অস্থি মজ্জায়, শয়নে স্বপনে জমি তার সর্বক্ষণের সাথী, তার জীবনসঙ্গী, তার ধ্যানজ্ঞান, তার প্রেম প্রীতি ভালোবাসা। নতুন জেগে ওঠা সদ্য যৌবনা জমির রূপ দেখে তাদের চোখ জুড়িয়ে যায়। তাদের কল্পনায় "জলের তলায় দীর্ঘদিনের লুকানো প্রাণশক্তি আলোর স্পর্শ পাইয়া অল্প প্রয়াসেই সোনা ঢালিয়া দিবে।------জমি তাদের বাড়ীর গায়ে,অনেকেই উঠানে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে পারিবে। ঘরের দায়ায় বসিয়া সোনালী ধানের উপর বাতাসের ঢেউ দেখিবে, স্ত্রীকে দেখাইবে। এই কল্পনায় তারা মশগুল হইয়া উঠিল।"স্বপ্ন মাখানো রঙীন কল্পনার জাল কেমন করে ছিন্ন হয়ে গেল উঠতি দোকানদার তথা সুদখোর তথা জমিদার বঙ্কিম কুণ্ডুর যাদু কাঠির ছোঁয়ায় শ্রী সেন এই উপন্যাসে তা দেখিয়েছেন।বাংলা সাহিত্যে কৃষক জীবন,তার রঙীন স্বপ্ন এবং সেই স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী আর কটা উপন্যাস আছে তা জানা নেই। এও জানা নেই কৃষকের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার কাহিনী, খাজনা আদায়ের এমন চতুরতা আর কোন্ উপন্যাসে আছে। পুলিশ পেয়াদা জমাদার চৌকিদার, বিচারক উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, জমিদার, সুদখোর, শিক্ষক প্রভৃতি তথাকথিত উচচবর্ণের ভদ্রলোক বলে পরিচিতরা কিভাবে মূর্ত্ত ও বিমূর্ত্তভাবে বা দৈহিক ও মানসিকভাবে একজোট এবং প্রয়োজনমতো জোটবদ্ধ হয় তা এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে সে সময়ের (১৯০৫) কংগ্রেসী আন্দোলনের চরিত্র, কংগ্রেস নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গী এবং কমিউনিষ্ট মতাদর্শে দীক্ষিত কিছু তণের চিন্তাধারা। সাহিত্যের ফুলবাগানে প্রস্ফুটিত গোলাপ গন্ধরাজ রজনীগন্ধার পাশাপাশি আরো অসংখ্য নামহীন অখ্যাত অবজ্ঞাত ফুলের সৌরভ-ই উপন্যাসের প্রাণশক্তি। রমেশচন্দ্র বস্তুনিষ্ঠ দরদী শিল্পী। তাই তাঁর রচনায় নেই কোন কারসাজী, কারচুপি, লুকিয়ে ফেলা বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা। তাঁর রচনার পক্ষপাতিত্ব আছে তবে সে পক্ষপাতিত্ব নির্যাতি তের প্রতি, সত্যের প্রতি, ন্যায়ের প্রতি। এখানে মূল মূল কয়েকটি বিষয় রসাস্বাদনের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে।

বানিয়া বৃত্তির স্বরূপঃ-

শ্রী সেন বঙ্কিম কুণ্ডু নামক চরিত্রের মারফৎ বানিয়া বৃত্তির স্বরূপ কিভাবে উদ্‌ঘাটন করেছেন তা নিচের কয়েকটি লাইনের মধ্যে ধরা পড়বে।

বঙ্কিমের 'বাবা হারাণ বাড়ি বাড়ি গুড় ফেরি করিয়া বেড়াইত। লোকটি ছিল ভালমানুষ। খরিদ্দার ঠকাইত না। ফাউ চাইলেই দিত। এগার বারো বছর বয়সে বঙ্কিমও বাবার সঙ্গে ঘুরিতে আরম্ভ করে। দু-দিন পরেই সে বলিল, এরকম করলে ব্যবসা চলবে কেমন করে ? ওজন কম দেবে না, অথচ লোকে ফাউ চাইলেই দেবে। এ কী রকম? হারাণ বলে, কী করব বল দেখি? দাঁড়িপাল্লাটা ঠিক করে নাও।

এ বঞ্চনা নয়। এর নাম ব্যবসা।"

বাবার মৃত্যুর পর ষোল বছর বয়সে রানী ডাঙার হাটে দোকান খুলিল।জিনিস সে কম দরে কিনিত, মিষ্টি কথা বলিয়া চড়া দামে বেচিত। ওজনে ঠকাইত। গরিবরা ধারে জিনিষ চাহিলে বলিত, যাও একটা বাসন কোষন কিছু নিয়ে এস। খালি হাতে কি মাল পাওয়া যায় ?

কুরপালার গরিবের পিতল কাঁসা তার দোকানে বন্ধক পড়ে। পড়িলে আর খালাস হয় না।'ঠিকই তো আছে বাবা। কেউ বলতে পারবে না হারাণ কুণ্ডু মাল কম দেয়। বঙ্কিম হাসে। সে দাঁড়ি পাল্লা ঠিক করিয়া দিলে হারাণ বলিল, এতে যে খদ্দেরকে প্রবঞ্চনা করা হবে।

অর্থশাস্ত্রের গভীরতার মধ্যে প্রবেশ না করেও (যা সাহিত্য রচনার মধ্যে প্রায় অসম্ভব) ব্যবসার আসল রহস্যটি তিনি তুলে ধরেছেন। ঠকানো, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, জাল-জুয়োচুরি যে টাকায় টাকা বাড়ানোর এক একটা পরশ পাথর তা তিনি অত্যন্ত সহজ সরলভাবে তুলে ধরেছেন। এগুলি যে পুঁজির তথাকথিত আদিম সঞ্চয়নের এক একটি যাদুকাঠি কার্ল মার্কস্ তা তঁার ক্যাপিটাল গ্রন্থে দেখিয়েছেন।

বানিয়া চরিত্রের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের পাশাপাশি একই সাথে তিনি তুলে ধরেছেন সামন্ত সমাজে তার দোসর সুদী পুঁজির কারবারীদের নির্লজ্জ চেহারা । পতনোন্মুখ জমিদাররাও কিভাবে এই কারবারীদের পাল্লায় পড়ে তার বর্ণনা আছে ঐ উপন্যাসে। "ঊনত্রিশ বৎসরের রায় বংশের দ্রুত পতন ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্বদমন দু-আনা দিন আনা সুদে টাকা খাটাইয়া বিশ ত্রিশ হাজার টাকার মালিক হইয়াছে। বর্ত্তমানে রমেন্দ্রকেও তার কাছে হাত পাতিতে হয়। ঋণের অঙ্ক এক একবার স্ফীত হয় আর বঙ্কিম কুণ্ডুর নিকট খানিকটা সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সর্বদমনের দেনা পরিশোধ করেন। রায় পরিবারে সর্বদমনের প্রতিপত্তি যথেষ্ট। কিন্তু রানীডাঙা কুরপালার লোকে তাকে বলে হাঁড়িমুখো চোবে।"

"সর্বদমন বন্ধকের ধার ধারে না। যার কাছে পারে দুই আনা চার আনা সুদে ধার দেয়।"দেনদারদের দরজায় লাঠি ঠুকিয়া বলে হামরা রূপেয়া লে আও। লোকে তাহাকে ভয় করে, যেভাবে হউক তার দেনা শোধ করিয়া দেয়।

"সে চার আনা সুদে ক্ষ্যান্তকে একটি টাকা দিল। কাগজে লিখিল দুটাকা। ক্ষ্যান্তর দুই হাতের বুড়া আঙুলের ছাপ লইয়া কালী পূজার জন্য দুই আনা কাটিয়া রাখিল।

কিংবা

কারফান বলিল, "দেড়শ টাকার খত। দিলাম ছয়কুড়ি, আটকুড়ি। এখনও সাড়ে তিনশ টাকা বাকি?

বঙ্কিম বলে ছ'কুড়ি আটকুড়ি দেওনি। দিয়েছ আড়াই কুড়িরও কম। যাক্, সান্যালমশাই হিসেবটা ওকে একবার বুঝিয়ে দিন।বৃদ্ধ সান্যাল সুদী কারবারের হিসেব রাখেন। নাকের চশমা লাগাইতে লাগাইতে তিনি বলিলেন, কর্তার কখনও ভুল হয় না। স্মরণশক্তি ওঁর অদ্ভুত। ব্যাস বশিষ্টের মতন। তবে যখন চাইছ, হিসাবটা একবার শুনে নাও।

এরফান বলে তা জানি। হিসাব ওনার ওষ্ঠের ডগায় বাস করেন। সাধে কি বড় হয়েছেন-বলিয়া সান্যাল হিসাব বুঝাইতে আরম্ভ করেন। চত্রবৃদ্ধি হারে সুদের হিসাব। দুই ছত্র শুনিয়া এরফান গলদঘর্ম হইয়া ওঠে।

প্রতিবাদী কৃষক চরিত্র ঃ

বাংলার বুকে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কৃষক সংগ্রাম ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে বৃটিশ শাসনের ভিতকে টলিয়ে দিয়েছিল সেরকম কোন প্রতিবাদী ঘটনার ছবি বা চরিত্র এই উপন্যাসে নেই। মামলা মকোদ্দমা আইন আদালতহল তাদের প্রতিবাদের রাস্তা। নতুন জেগে ওঠা চর চর জমির দখল রাখতে তারা পুরানো জমিদারের শরণাপন্ন হয়। পুরনো জমিদার রমেন্দ্রর মাথায় যখন লাঠির বাড়ী পড়ে তখনও তারা এক প্রকার সহানুভুতিই দেখায়, ঘৃণা ক্রোধ রাগের চিহ্নস্বরূপ উল্লাসে ফেটে পড়ে না। আসলে যে সময়কার ঘটনা (১৯০৫-বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন) সে সময় বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ও দু-একটি প্রতিবাদী চরিত্র ব্যতীত বাংলাদেশে কৃষক সংগ্রামের ঝাঁজ ম্রিয়মান। শহুরে মধ্য শ্রেণীর বিকাশ এবং কংগ্রেসের কার্যকলাপ বাংলার কৃষক সংগ্রামের ঐতিহ্যকে সাময়িকভাবে হলেও পথভ্রষ্ট করতে সাহায্য করেছিল তা এই উপন্যাস পড়লে বোঝা যায়। তাছাড়া বিশেষত এই যে উপন্যাসকার নিজে একসময় কংগ্রেসেরসঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার প্রতিফলন হয়ত এই উপন্যাসে পড়েছে। কৃষক প্রতিবাদী চরিত্র হিসাবে এই উপন্যাসে যে হাতে গোনা চরিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নারায়ন। তার কিঞ্চিত পরিচয় নিচের কয়েক লাইন থেকে মিলবে।

(১) নারায়ন সর্দার বলিল, ঠাট্টার আর জায়গা পাও নাই বুঝি? কালিপদ উত্তর করে, আমার বাবু লাখো লাখো টাকার মালিক; তিনি ঠাট্টা বটকেরা করতে আসবেন ছোটলোকের সঙ্গে? নারায়ন বলিল, কথায় কথায় জাত তুলিও না ঠাকুর। আলবৎ তুলব। তোকে আবার ভদ্রলোক বলতে হবে নাকি? নারায়নের বুকের ছাতি ফুলিয়া ওঠে। সে বলে, কও তো ঠাকুর, কও দেখি আর একবার।"

(২) "চলে যাও তোমরা, মাঠ থেকে বেরিয়ে যাও।"

নারায়ণ বুকের ছাতি ফুলাইয়া দারোগার সামনে আসিয়া বলে, কেন যাব আমরা। এ জমি তো আমারগো। অন্যায় হুকুম করবা আর আমরা তাই শোন্‌ব?

(৩) "রোজই বেশি রাত্রে রামেন্দ্র মোল্লার ভিটা দিয়া ফেরেন। তাকে মারিবার জন্য সে ভিটায় লুকাইয়া ছিল। ঘটনার দিন রাত্রে তাঁকে দেখিয়াই ছুটিয়া গিয়া সে এক ঘা বসাইয়া দেয়। হাকিম প্রশ্ন করেন, রামেন্দ্রবাবু গ্রামের জমিদার। তুমি ত াকে মারলে কেন? উনি যখন সন্ধ্যার সময় কুরপালায় যাইতেছিলেন, আমি তখন শুধাইলাম এটা করলেন কেন বড় রাজ া? টাকা খাইলেন আমার গো আর ভুঁই দিলেন কুণ্ডুর পোরে? বাবু তখন আমারে বাপ মা তুলিয়া গালাগালি করিল। ত াই প্রতিশোধ নিছি।"

এই নারায়নই হতে পারত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কিন্তু রমেশচন্দ্র তার জায়গায় নিয়ে এলেন উচচ শিক্ষিত, প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী, অস্তমিত জমিদার পুত্র শঙ্করকে যে গান্ধীজির কংগ্রেস আদর্শে দীক্ষিত। বিপরীতে বিশিষ্ট নারী চরিত্র হাস্যকে বিধবাই রেখে দিলেন। নারায়নের সঙ্গে যদি হাস্যের মিলন হত তাহলে সেটাই হত স্বাভাবিক সুন্দর। কিন্তু তাঁর মাথায় আছে কংগ্রেস, সেই কংগ্রেসকে আনতে হবে, সৎ আর অসৎ কংগ্রেসের দ্বৈরথ নির্মানকরতে হবে। ফলে স্বাভ াবিক নর-নারীর সম্পর্ককে কৃষক জীবন ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ভিড়িয়ে দিতে হল শহুরে সভ্যতার শিক্ষিত শঙ্করের দিকে এবং শঙ্করের চরিত্রকে আরো উজ্জ্বল করতে হাস্যের প্রতি শঙ্করের প্রেমের নির্লিপ্ততার ছবি আঁকতে হল। উপন্যাসে বর্ণিত নার ায়ন আর হাস্যের দুটি অসাধারণ মিলন দৃশ্যের লোভ সম্বরণ করতে না পেরে নিচে তুলে দেওয়া হল। প্রথমটি শঙ্করের মঞ্চে আবির্ভাবের পূর্বে দুই কিশোর কিশোরীর নীরব নিচচারিতপ্রকৃতির কাদা মাখানো প্রেম এবং দ্বিতীয়টি শঙ্করের অ াগমনের পরবর্ত্তী দুই যুবক যুবতীর মানবীর প্রেম।

প্রথমতঃ "খুব ঘনিষ্ঠ না হইলেও নারায়ণই জগুর নিকটতম জ্ঞাতি। বিবাহের পর হাস্যের সঙ্গেসমবয়সীএই দেবরের বেশ ভাব হয়। তের-চৌদ্দ বছরের দুইটি ছেলে মেয়ে একত্র হইয়া বাগান ঘুরিয়া বেড়াইত। নারায়ন ঢিলছুড়িয়া কাঁচা মিঠা অ াম পাড়িত। দুজনে মাখিয়া খাইত। হাস্য পাকা গাব ভালোবাসে বলিয়া নারায়ন বড়বড় গাছে উঠিয়া গাব পাড়িয়া দিত। হাস্য প্রশ্ন করিত, ভয় করে না তোমার, নাড়ু ঠাকুরপো?

ভয় আমার নাই, হাস্য বৌ? দেখ না বড়গো লাগে কেমন কাজিয়া করি।

তার মায়ের দেখাদেখি নারায়ন তখন ডাকিত, হাস্য বৌ। এখন বলে হাস্য বৌঠান।

একদিন দুপুর রোদে মাচার তলায় স্নিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া তারা দুটিতে পরম নিশ্চিন্তে কাঁচা শসা খাইতেছিল। গাছ হইতে ভ াঙে আর খায়। এই সময় মাঠ হইতে জগু বাড়ী ফেরে। সে ডাকে, বৌ, ও বৌ কোথায় গেলা?

দুটিতে তখন মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। এর পরই ধরা পড়িয়া গেল। জগু নারায়নের কান ধরিয়া টানিয়া আনিল। হাস্য গেল পলাইয়া।-------

আজ নারায়ণের জেলের খবরে তার দুঃখ কি আনন্দ কোন্‌টা যে বেশি হইল হাস্য নিজেই তাহা বুঝিতে পারিল না।"

দ্বিতীয়ঃ "শশা খাইতে খাইতে নারায়ণ বলিল, তুমি একটু খাও।

না থাউক।

কেন তুমি তো শশা ভালোবাসো। মনে আছে মাচার তলায় সেই শশা চুরি?--বলিয়া নারায়ণ হাসিয়া ফেলে।

হাস্যও ফিক করিয়া হাসিয়াছিল।----

নারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ভাবতেছ বৌঠান।

হাস্য জবাব দেয়, ও কিছু না।--------

গভীর রাত্রে সে ছটফট করিতেছে টের পাইয়া হাস্য তার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখনো ঘুমাও নাই যে? দুপুর রাতের বাজকুড়াল পাখী কত আগে ডাইক্কা গেছে। নারায়ণ বলিল গেছে নাকি? আমি ত টের পাই নাই।

হাস্য জিজ্ঞাসা করে তোমার শরীর খারাপ লাগে বুঝি?

ঘুম আসে না, কেমন যেন অস্থির লাগে।

হাস্য হাত দিয়া পাখা করে আর এক আঙুল দিয়া মাথার চুলের মধ্যে সুড়সুড়ি দেয়।---

হাস্য বলে লক্ষ্মীটির মতন চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাক দেখি। ঘুম এখনই আসবে।

প্রদীপের আলোয় দরমার বেড়ার উপর পূর্ণযৌবনা হাস্যের ছায়া দেখা যায়।---নারায়ণ একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া থাকে, চোখ আর ফিরাইতে পারে না।

সে হাস্যের উর উপর একখানা হাত রাখিল। হাস্য সরিয়া বসিল না, হাতখানাও সরাইয়া দিল না----

-----তারই বিপদের আশঙ্কায় রাত্রির পর রাত্রি সকলের অগোচরে আসিয়া পাহারা দেয় শুনিয়া হাস্যের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া ওঠে। তার সহানুভূতি হয়।

নারায়ণ তাহার সুডোল বাহু ধরিয়া ধীরে ধীরে চাপ দেয়। লক্ষ করে,হাস্য একটু একটু কাঁপিতেছে। তারওসর্বাঙ্গ ঘামিয়া যায়। সে হঠাৎ ঝড়ের বেগে হাস্যকে বুকে চাপিয়া তার মুখে চুমা খায়, চুমা খায় চোখের পাতার উপর।"

রমেশচন্দ্র সেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এবং কোন এক সময়ে তিনিবাংলার সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তা তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছেন। উপন্যাসে বর্ণিত নারায়ণ চরিত্রটির সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মিল আছে। নারায়ণের একনিষ্ঠ কংগ্রেস কর্মী হয়ে ওঠা, জমিদার রামেন্দ্রকে মারার জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেস থেকে দূরে সরে থাকা (যদিও হাস্যের প্রতি ব্যক্তিগত অনুরাগের কারণে) এ সবই যেন রমেশচন্দ্রের ব্যক্তি জীবনের প্রতিফলন।কিন্তু প্রশ্ন হল সমসাময়িক জগৎ ত্যাগ করে ১৯০৫ সাল বেছে নেওয়ার পশ্চাতে কোন্ উদ্দেশ্য নিহিত। প্রথমত, সমালোচনার বা আক্রমনের বিভিন্ন ধরণ আছে। কখনো মুখোমুখি, সামনা সামনি, কখনো পেছন থেকে বা কখনো পাশ থেকে। কোন অবস্থান থেকে আক্রমণ করা হবে তা নির্ভর করে আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত দু-তরফের শক্তির তারতম্যের বিচারে। কুরপালা উপন্যাসে শঙ্কর, হন্দুপ্রকাশ, বিষ্ণু চ্যাটার্জী-র মাধ্যমে যে কংগ্রেসকে তিনি এনেছেন তা তাঁর আদর্শায়িত কংগ্রেস, তাঁর কল্পনায় স্বপ্নেরকংগ্রেস। সেখানে তিনি কংগ্রেস ভেকধারী প্রতিক্রিয়াশীল, সুবিধাবাদী শক্তিকে দুরমুশ করে ছেড়েছেন। আসলে তিনি সমসাময়িক কংগ্রেসকেই আক্রমণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু শক্তির বিচারে তিনি দুর্বল বিশেষত সে সময়ের রমরম করা কংগ্রেসের বিচারে। দুর্বলহয়ে সবলের বিদ্ধে লড়তে গেলে পিছনের দিকে সরে যেতেই হবে। মনে রাখতে হবে উপন্যাসটা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৪৬ সালে এবং সে সময় সমসাময়িক কংগ্রেসের সমালোচনা করা অত সহজ নয়।

রমেশচন্দ্রের প্রকাশিত জীবনী থেকে জানা যায় যে তাঁর সংগঠন চিন্তা ছিল প্রখর এবং তিনি নিজেও একজন ছিলেন সংগঠক। কোন কিছু ইতিবাচক সৃষ্টিশীলতা সংগঠন বিনা যে অসম্ভব তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সংগঠন চিন্তা আজকের মতো একদেশদর্শী, যান্ত্রিক, পার্টিজান ছিল না। তাই তিনি বিভিন্ন মতের পথের মানুষকে নিয়ে চলতে পারতেন। তাঁর সৃষ্ট সংগঠন 'সাহিত্য সেবক সমিতি' ছিল এরকমই এক সংগঠন। একই লক্ষ্যে ধাবিত বিভিন্ন পথের মানুষকে নিয়ে যে একসঙ্গে চলা যায় তার প্রতিফলন এই উপন্যাসে রয়েছে। 'উন্নত নাসা, প্রশস্ত ললাট, গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, গায়ে নামাবলী, পায়ে খড়ম, পরিধানে শুভ্রবাস, মাথায় কাশগুচ্ছের মতন সাদা চুলের, ইন্দুপ্রকাশ যেমন রয়েছেন বা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত কংগ্রেসী শঙ্কর যেমন আছে তেমনি আছে রোগা-পটকা, সাদাসিধা, কূটকপটের ধার না ধারা স্পষ্টবাদী জেল ফেরত কমিউনিষ্ট বিষ্ণু। প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক অতি নিবিড়, প্রগাঢ় ভালোবাসার। সবাই একসঙ্গে স্কুল চালায়, মিছিল করে,রাস্তা তৈরীর কাজে হাত লাগায়। কমিউনিষ্ট বিষ্ণু আর কংগ্রেসী শঙ্করের বন্ধুত্ব দেখার মতো। বিষ্ণু কিভাবে কমিউনিষ্ট মতাদর্শে আকৃষ্ট হল তার বর্ণনাও আছে এবং তার নতুন কি উপলব্ধি হল, কেমনভাবে ঘটনার সে ব্যাখ্যা করতে লাগল তার কিঞ্চিত বিবরণও আছে।পাঠকের পরিচয়ের স্বার্থে কিছু কিছু অংশ নিচে তুলে দেওয়া হল।

(১) "শঙ্কর বিষ্ণুর শিয়রের বইগুলি নাড়াচাড়া করিতেছিল। সবগুলিই কমিউনিষ্ট সাহিত্য। বিষ্ণুর হাতের কাছের বইখানি তুলিয়া দেখিল শ বিপ্লবের ইতিহাস। শঙ্কর বলিল, তুমি দেখছি পুরাদস্তুর কম্যুনিষ্ট বনে গেছ।

তা আর পারলাম কই ? আর পারাও খুব শক্ত। তবে আমার ধারণা ঐ মতবাদ গ্রহণ করতে পারলে এদেশ অন্তত ধর্মান্ধতার হাত থেকে, অসংখ্য নরহত্যা থেকে রেহাই পেত।

শঙ্কর বলিল জেলে তো তোমার ওদিকে কোনো ঝোঁক দেখেনি। তুমি চলে আসার পরই সুধীর দাশ বলে একজন বন্দী এলেন, ইউনির্ভাসিটি থেকে সদ্য বার হওয়া একটি তণ। তীক্ষ্ম ধীশক্তি, কালচার ও তেজস্বিতার সংমিশ্রনেছেলেটি ছিল যজ্ঞের অগ্নিশিখার মতন।তার কাছেই আমার হাতে খড়ি। সে বেচারীও এই জ্বর আর কাসিতে ভুগছে। হয়ত একদিন চলে

যাবে, Uncared for unhonouredক্রস্তু ক্তুব্দক্তুব্ধ---বলিতে বলিতে বিষ্ণুর চোখ বাস্পার্দ্র হইয়া উয়িল।”
(২) বিষ্ণু বলিল দোষ দেবেন রায়ের নয়, সমাজ ব্যবস্থার। It is system Dudu, ন্তুন্দ্মনব্ধপ্তুনব্দব্ধ ব্দন্তুব্দব্ধন্দপ্প. ইন্দুপ্রকাশ বলিলেন, তুমি তো সব ব্যাপারেই ধনতান্ত্রিক সমাজের দোষ দেখতে পাও। সেদিন যদু এসেছিল স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে নালিশ করতে। তুমি সামনে থাকলে বলতে এও ধনতন্ত্রের দোষ।
বিষ্ণু কহিল নিশ্চয় বলতাম। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, ওখানেও টাকা পয়সার ব্যাপার আছে।
(৩) “বৃদ্ধ ইন্দুপ্রকাশ ভাবেন, কুরপালার চাষী মজুরের কথা। এতদিন তবু চাষীদের দু’এক বিঘা করিয়া জমি ছিল। মজুরের ছিল নিজ নিজ যন্ত্র ও হাতিয়ার কিন্তু এবার তারা সম্পূর্ণ নিঃস্ব বনিয়া গেল, বড় বড় শহরের কুলি মজুরের মতন গৃহহারা সর্বহারা।
সমগ্র উপন্যাস জুড়ে শ্রী সেন নিপীড়ক এবং নিপীড়িতের যে ছবি এঁকেছেন তা এককথায় অনবদ্য। কিন্তু তিনি এই পরিবর্ত্তনটা দেখিয়েছেন ১৯০৫ এর পর এবং তাও এক অজ পাড়াগাঁয়ে কাপড়ের কল স্থাপনের মধ্য দিয়ে। এটা কতে াদুর যুক্তিসঙ্গত, কতখানি ঐতিহাসিক প্রামান্য নির্ভর তা ভাববার বিষয়। মনে হয় শী আদর্শের ছায়া তাঁকে গ্রাস করেছিল (যা বিষ্ণুর মুখ দিয়ে বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে) গাঁয়ে কাপড়ের কল বানিয়ে গৃহহারা সর্বহারাদের দেখাতে হয়েছে। কিন্তু সে যাহবিষ্ণু বলিল, এই থেকে দেশে আরম্ভ হবে সত্যকার শ্রেণী সংগ্রাম। আর সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়া আসবে মুক্তি। আমার বিশ্বাস ভারতের মুক্তি এই পথে--বলিয়া সে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত করিয়া দিল। মনে হইল এই তণ যেন চে াখের সামনে সেই পথকে দিনের আলোর মতন পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে।”
হোক বাংলার সমাজকে চিনতে জানতে শ্রী সেনের কুরপালা এক দর্পণ। বাইরের পরিবর্ত্তনটুকু বাদ দিলেসেই ট্রাডিশান কেবল বহমান নয় আরো ত্রূর, আরো সুক্ষ্ম ছল চাতুরীর ওপর ভর করে তা ত্রমাগত বেগবান।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com